ধারাবাহিক রচনা

সৎসঙ্গরত্নাবলি

স্বামী ধীরেশানন্দ

[শ্রীমৎ স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজের 'সৎসঙ্গরত্নাবলি' নামে সংকলনটি 'নিবোধত' পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ। উত্তরাখণ্ডের কয়েকজন উচ্চকোটির সাধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁদের উচ্চ চিন্তারাজি এই সংকলনের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান সংখ্যায় কনখলের মহাত্মা স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের উপদেশাবলি সংকলিত হয়েছে।]

পতিতপাবন

ভগবান পতিতপাবন। নারদের বড় অভিমান যে তিনি বড় ভক্ত। বিল্বমঙ্গল বেশ্যাসক্ত, ঘোর পাষণ্ড। ভগবান নারদকে পাঠাইলেন বিল্বমঙ্গলকে উপদেশ দিয়া ভক্ত করিবার জন্য। বিল্বমঙ্গলের তাড়া খাইয়া নারদ পলাইয়া আসিলেন। আসিয়া ভগবানকে বলিলেন যে বিল্বমঙ্গল মহা পাষণ্ড, ভগবদ্‌বিষয়ে কোনও কথা শুনিতেই রাজি নহে। এদিকে বেশ্যার গালাগাল খাইয়া বিল্বমঙ্গলের বৈরাগ্য হইয়াছে, চৈতন্য হইয়াছে। সংসারে আর থাকিবে না। যে-আশ্রমে থাকিতে যায়, তাহারাই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, কারণ তাহার পাপাচার সর্বজনপ্রসিদ্ধ। সে রাস্তার ধারে বসিয়া আছে। বৈরাগ্য হইয়াছে—সংসারে আর ফিরিয়া যাইবে না।

এদিকে ভগবানের পেটে ভয়ানক বেদনা। নারদকে বলিলেন, ''যদি কেউ তার কলিজা দেয় তবে সেটা খেলে এই বেদনা সারবে।'' নারদ বলিলেন, ''আপনার কত ভক্ত আছে, কেউ না কেউ অবশ্য দেবে। এ আর বেশি কথা কী? আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'' কিন্তু কেহ কলিজা দিতে রাজি হইল না। পাগল বলিয়া সকলে নারদকে তাড়াইয়া দিল। অবশেষে বিল্বমঙ্গল নারদের কথা শুনিয়া কলিজা দিতে রাজি হইল। চাকু দিয়া বুক কাটিতে যাইতেছে এমন সময় ভগবান তাহাকে দর্শন দিয়া বাধা দিলেন—পেটের বেদনা সারিয়া গিয়াছে। আসিবার সময় ভগবান নারদকে বলিলেন, ''দেখলে কে ভক্ত? কলিজা তোমার ছিল না? তুমি দিতে পারলে না?''

নারদের অভিমান দূর হইল।

গুরুশিষ্য

যে-গুরু শিষ্যকে চিরকাল শিষ্যই বানাইয়া রাখেন তাঁহার গুরুগিরি ব্যর্থ। সে তো বেচারা বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময়ই শিষ্য হইয়া আসিয়াছে। আসিয়াছে সে গুরু অর্থাৎ সর্ববৃহৎ ব্রহ্ম হওয়ার জন্য। কাজেই যে-গুরু শিষ্যকে গুরু বানাইয়া দেন তিনিই ঠিক ঠিক গুরু। আর যিনি শিষ্যকে গুরু অর্থাৎ ব্রহ্ম বানান না, শিষ্যই করিয়া রাখেন নিজের কিছু প্রাপ্তি আদি সুবিধার জন্য, তিনি গুরুপদবাচ্যই নহেন।

প্রথম বৈরাগ্য

বাড়ি ছাড়িবার সময় সাধুদের কী বৈরাগ্য! যেন আকাশে কুঠিয়া তৈয়ার করিবে। তখন বিষয়ে দোষদর্শন ও প্রতিকূল পরিবেশের জন্য মনে খুব জোর থাকে। বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়া বৈরাগ্য থাকিতে থাকিতে যদি কাজ গুছাইয়া লয় তো ভাল। নতুবা সে-বৈরাগ্য বেশি দিন থাকে না। প্রতিকূল চাপের অভাবে শুকাইয়া যায়। যদি বিচারদ্বারা সে-বৈরাগ্য স্থায়ী করিতে পারে ও অধ্যাত্মজ্ঞানের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায় তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

এক জাঠ। পরিশ্রম করিয়াও উদরান্নের সংস্থান হয় না। বিরক্ত হইয়া সাধু হইতে গেল এক মঠে। সেখানেও কত কাজ! ভাবিল, ''এখানে কতকাল গোবর কুড়োব? যাই নিজেই গেরুয়া পরে কোথাও সাধু হয়ে বসব।'' সাধুবেশ নিয়া এক শহরের ধারে গাছতলায় চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। কোনও দিকে তাকায় না। খুব নাম হইয়া গেল। লোকে কত জিনিস লইয়া আসে। চাহিয়াও দেখে না। কিছুই লয় না। বড় 'বিরক্ত' মহাত্মা। এক বানিয়া একটি থালায় করিয়া অনেক মণিমুক্তা ভেট লইয়া আসিল। ভাবিল, ''সাধু তো কিছু নেয় না, এসব তো আমারই থাকবে, মাঝখান থেকে আমার কিছু নাম হবে, মন্দ কী!'' সাধু মণিমুক্তার ভেট দেখিয়া বলিলেন, ''লোকে বিরক্ত করে, এ নাও, সে নাও বলে, মহা আপদ! আচ্ছা, তোমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য আমি গ্রহণ করলাম।'' বানিয়ার তো চক্ষুস্থির! খানিক পরে সাধু সব মণিমুক্তা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ''নিয়ে যাও তোমার মণিমুক্তা, এসব আমি চাই না।'' লোকে এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সাধু বলিলেন, ''আমি যথার্থ সাধু না হয়েও এত সম্মান, উপহারাদি পাচ্ছি, তাই ভাবলুম যথার্থ সাধু যদি হতে পারি, তবে সর্ব ঐশ্বর্যের মালিক ভগবানকেও পেতে পারি। এই ভেবে মণিমুক্তা ফেলে দিলাম।''

কাজেই দেখো, প্রথমকার শ্মশান বৈরাগ্য বা আপাত বৈরাগ্যও যথার্থ বৈরাগ্যে পরিণত হয়, যদি বিচার থাকে।

মনে করো কোনও লোক জাহাজ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছে। সমুদ্র বা নদীর স্বভাব এই যে, কোনও জিনিস মধ্যস্থলে থাকিতে দেয় না, কিনারে আনিয়া ফেলে। সে-লোকটিও একটি কাঠের মতো ভাসিতে ভাসিতে কিনারায় আসিয়া লাগিয়াছে। ঢেউয়ে একবার কিনারায় লাগিতেছে, আবার জলে পড়িতেছে। এখন যদি কেহ একটু ধাক্কা দিয়া কিনারার দিকে তাহাকে একটু ঠেলিয়া দেয় তাহা হইলে সে আর জলে পড়ে না ও কিছুকাল পর হুঁশ ফিরিলে সবল হইয়া নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে। তেমনি দোষদৃষ্টির বৈরাগ্য বেশি দিন থাকে না। আবার ভোগের দিকে মানুষ যাইতে চায়। তখন যদি একটু সৎসঙ্গ সে পায় তো পরমার্থের দিকে উঠিয়া পড়িতে পারে, নতুবা সংসারজলে ডুবিয়া যায়।

সম্যক জ্ঞান হইলে বিষয়-মিথ্যাত্বরূপ বৈরাগ্য হয়। সেই বৈরাগ্যই পাকা বৈরাগ্য।

বিচার করিয়া বুঝা

কোনও বইয়ে কিছু লিখা আছে বলিয়াই সেটি মানিতে হইবে? বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে না? এক বানিয়াকে জব্দ করিবার জন্য তাহার বন্ধুগণ তাহাকে এক চিঠি দিয়াছে যে তাহার স্ত্রী বিধবা হইয়া গিয়াছে। সে মহাদুঃখী। লোকেরা বলিতেছে, ''তুই পাগল, তুই বেঁচে থাকতে তোর স্ত্রী বিধবা হবে কী করে?'' কিন্তু বানিয়া কিছুতেই বুঝিবে না। সে বার বার চিঠি দেখায় আর বলে, ''এরা কি আর মিথ্যা কথা লিখেছে?''—''লিখলই বা চিঠি, কিন্তু সেটা বিচার করে বুঝতে হবে তো?''

অন্য সকল গ্রন্থ বিষয়েও তাহা। ছাপার অক্ষর দেখিলেই তাহার গোলাম হইয়া যাইও না। নিজে বিচার করিয়া সকল কথা লইবে।

সাধুর যথাসর্বস্ব

এক বিদ্বান সাধু পুলিশের থানার পাশেই পড়িয়া থাকিতেন। থানাদার তাঁহার ভক্ত ছিল। সাধুর সম্বল ছিল একমাত্র একটি ছেঁড়া কাঁথা। একদিন সাধু অন্যত্র গিয়াছেন। থানাদার তাঁহার কাঁথাটা লুকাইয়া রাখিল। সাধু ফিরিয়া আসিয়া কাঁথা নাই দেখিয়া বলিলেন, তাঁহার যথাসর্বস্ব চুরি হইয়া গিয়াছে। থানাদার বলিল, ''মহারাজ, থানায় রিপোর্ট দাও। আমি লিখছি। তোমার কী কী জিনিস চুরি হয়েছে বল।'' সাধু বলিলেন, ''আমার গদি তোষক বালিশ জামা আচ্ছাদন, ঠেসান দেবার তাকিয়া, সিন্দুক সব চুরি গেছে।'' থানাদার কাঁথাটি ফিরাইয়া দিয়া বলিল, ''এইটি তোমার?'' ''হ্যাঁ।'' ''তবে, মিথ্যা কথা বলে অত জিনিসের ফর্দ দিলে কেন?'' সাধু—''আমি ঠিকই বলেছি। দেখো, যখন পেতে শুই তখন এই কাঁথা আমার গদি বা তোষক! যখন পুঁটলি পাকিয়ে মাথার নিচে রাখি তখন এটা আমার বালিশ। যখন গায়ে দিয়ে বেড়াই তখন এটা আমার জামা। যখন গায়ে দিয়ে শুই তখন এটাই হয় আচ্ছাদন। যখন কোনও জিনিস এটার মধ্যে জড়িয়ে রাখি তখন এটা আমার সিন্দুক।—কাজেই এটাই আমার সব।''

তেমনই এক পরমাত্মাই সব। তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়। তিনিই সর্বজগৎ।

তিনি সর্বপ্রকাশক মানে ইহা নহে যে কতকগুলো বস্তু পৃথক রহিয়াছে আর তিনি সেইগুলি প্রকাশ করিতেছেন। সাক্ষী বা পরমাত্মা সর্বপ্রকাশক—ইহার অর্থ এই যে সাক্ষী বা পরমাত্মাই সব হইয়া রহিয়াছেন। তিনিই সর্বরূপে প্রতীত হইতেছেন।

গৃহস্থ কে?

'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'। গৃহিণীই গৃহ। গৃহিণী হইতেছে অবিদ্যা। অবিদ্যাবান পুরুষই গৃহস্থ। আর জ্ঞানীই ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী।

যোগভ্রষ্ট ও কর্মভ্রষ্ট

গীতায় যে-যোগভ্রষ্টের কথা আছে তিনি সামান্য সন্ন্যাসীমাত্র নহেন (শাংকরভাষ্য ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকা দ্রষ্টব্য)। অতি শুদ্ধান্তঃকরণ শমাদিবান বিচারশীল ধ্যানী সন্ন্যাসী যদি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিবার পূর্বেই মারা যান অর্থাৎ আয়ু শেষ হয় তবে তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট বলা হয়। তাঁহারই শুচি, শ্রীমান, বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ যোগীদের কুলে জন্ম হয়। অপর সন্ন্যাসী যাহারা কদাচারে রত তাহারা যোগভ্রষ্ট নয়, তাহারা কর্মভ্রষ্ট। তাহাদের ভাবনানুযায়ী উত্তমাধম গতি হইবে। আর যাহারা একটা কিছু গোলমাল হইয়া গেলেও সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ভগবদারাধনায় রত হয়, তাহারা উদ্ধার পাইয়া যায়, কারণ তাহারা সাধু, সম্যক্ নিশ্চয়বান্—

''অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥''

দুঃখনিবৃত্তির উপায়

লোকে বলে, 'সাম দান ভেদ দণ্ড'—এই চারিটি দুঃখনিবৃত্তির উপায়। ইহা জগৎ-সত্যত্ববাদী রাজনৈতিক পুরুষদের কথা। তাহারা অন্য তিনটি উপায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

মোট উপায় সাতটি—''সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, মায়া, ইন্দ্রজাল ও উপেক্ষা।'' শেষের তিনটিই মুখ্য উপায়। জগৎকে মায়া বলিয়া জানা বা ইন্দ্রজাল বলিয়া জানা বা মিথ্যা জানিয়া উপেক্ষা করা। মায়া ও ইন্দ্রজালে পার্থক্য রহিয়াছে। ইন্দ্রজাল গুরুপরম্পরায় শিখিতে হয় আর মায়া শিখিতে হয় না। ইহা স্বাভাবিক। বস্তু নাই, একটা প্রতীতি মাত্র। খণ্ড সত্যত্ববোধ হইতে বাসনা উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রতীতিমাত্র বোধে বাসনা জন্মায় না। মায়া, উপেক্ষা ও ইন্দ্রজালরূপে বিচার জগৎ-মিথ্যাত্ববোধ উৎপন্ন করে। *(ক্রমশ)*